Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি শাসনব্যবস্থা - খিলাফত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফয়সাল আহমেদ

রোলঃ 23100110083

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি শাসনব্যবস্থা - খিলাফত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফয়সাল আহমেদ

রোলঃ 23100110083

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি শাসনব্যবস্থা – খিলাফত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফয়সাল আহমেদ, আইডিঃ 23100110083 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি শাসনব্যবস্থা – খিলাফত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Faysal Ahmed

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ফয়সাল আহমেদ

আইডিঃ 23100110083

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

গবেষণার পটভূমি 2

গবেষণার উদ্দেশ্য 2

গবেষণার পদ্ধতি 2

গবেষণার গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা 3

প্রথম অধ্যায়: খেলাফত পরিচিতি 4

শব্দ তিনটির শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা 4

ইমামত 5

খেলাফত 5

তিন পরিভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক 6

দ্বিতীয় অধ্যায়: খিলাফতের শরঈ ভিত্তি 7

প্রথম উৎস: আল-কুরআন 7

দ্বিতীয় উৎস: সুন্নাহ 8

খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ 9

তৃতীয় উৎস: ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) 9

চতুর্থ উৎস: কিয়াস ও যুক্তি 10

তৃতীয় অধ্যায়: খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিধান ও গুরুত্ব 11

খিলাফত প্রতিষ্ঠা: ফরযে কিফায়া 11

মতপার্থক্যের পর্যালোচনা 12

খিলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 12

চতুর্থ অধ্যায়: খলিফার যোগ্যতা, নির্বাচন ও বায়আত 13

খলিফার যোগ্যতা ও শর্তাবলি 13

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি 14

এক. আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর নির্বাচন.....14
দুই. পূর্ববর্তী খলিফার মনোনয়ন (ইসতিখলাফ).....14
তিন. শূরা কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন.....14
বায়আত: কর্তৃত্বের শরঈ ভিত্তি.....15
পঞ্চম অধ্যায়: খুলাফায়ে রাশেদীন — আদর্শ খিলাফতের নমুনা.....16
প্রথম খলিফা: হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.....16
বংশ পরিচয়, জন্ম ও উপাধি.....17
জাহিলী যুগে আবু বকর রা.-এর মর্যাদা ও দায়িত্ব.....17
ইসলাম গ্রহণ.....18
পারিবারিক জীবন.....19
খিলাফতের দায়িত্বে বাইআত: সাকিফার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট.....19
খিলাফতকালের কর্মতৎপরতা ও বিজয়সমূহ.....20
অসীয়ত (উপদেশ) ও ইন্তিকাল.....21
দ্বিতীয় খলিফা: হযরত উমর ফারুক রা.....22
তৃতীয় খলিফা: হযরত উসমান ইবনে আফফান রা.....23
চতুর্থ খলিফা: হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রা.....23
খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য.....23
ষষ্ঠ অধ্যায়: খিলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য.....24
খিলাফত ও মুলুকিয়াতের মৌলিক পার্থক্য.....24
পরবর্তী ইসলামি সাম্রাজ্যসমূহ.....25
নবম অধ্যায়: খিলাফতের পতন ও বিলুপ্তি (১৯২৪).....29
পতনের পশ্চাৎপট ও কারণসমূহ.....29
পতনের পরিণতি.....29
দশম অধ্যায়: আধুনিক যুগে খিলাফত — প্রাসঙ্গিকতা ও চ্যালেঞ্জ.....31

খিলাফত-চিন্তার সমকালীন ধারা 31
সমকালীন চ্যালেঞ্জসমূহ 31
ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি 32
উপসংহার 32
তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি 33

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন এবং নিজ জীবনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগি ও নৈতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো ধর্ম নয়; বরং এটি একটি সর্বাত্মক জীবনব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই সর্বাত্মক জীবনব্যবস্থার রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দিকটিই পরিভাষায় 'খিলাফত' নামে পরিচিত। খিলাফত হলো সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে তাঁরই নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী মানবীয় কল্যাণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

মানবেতিহাসে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার অসংখ্য মতবাদ ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছে—রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি। এই সকল মতবাদের মূল ভিত্তি হলো মানবীয় চিন্তা ও খেয়ালখুশি। পক্ষান্তরে খিলাফত হলো এমন এক ব্যবস্থা যার আইনগত ভিত্তি ও কর্তৃত্বের উৎস স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। এ কারণেই খিলাফত মানবরচিত সকল ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

গবেষণার পটভূমি

১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তির পর মুসলিম উম্মাহ এক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন অবস্থায় উপনীত হয়। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক বিভাজন, ঔপনিবেশিক আধিপত্য এবং পরিচয়ের সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। বর্তমান সময়ে 'ইসলামি শাসনব্যবস্থা' ও 'খিলাফত' সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা, অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে। কতিপয় গোষ্ঠী খিলাফতকে সন্ত্রাস ও সহিংসতার সমার্থক বানিয়ে উপস্থাপন করছে, আবার কেউ একে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। এই বাস্তবতায় কুরআন, সুন্নাহ ও নির্ভরযোগ্য ইসলামি উৎসের আলোকে খিলাফতের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং নির্ভরযোগ্য ফিকহি ও ঐতিহাসিক উৎসের আলোকে ইসলামি শাসনব্যবস্থা তথা খিলাফতের পরিচয়, মূলনীতি, কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। বিশেষভাবে এই গবেষণায় খিলাফতের শরঈ ভিত্তি, খলিফার যোগ্যতা ও নির্বাচনপদ্ধতি, খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ শাসনের রূপরেখা, এবং খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেইসাথে আধুনিক যুগে খিলাফতের প্রাসঙ্গিকতা ও তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহও আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণাপত্রটি মূলত গুণগত (Qualitative) ও বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। এতে গ্রন্থাগারভিত্তিক (Library-based) উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে আল-কুরআনুল কারীম ও বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করা হয়েছে, এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে শাস্ত্রীয় ফিকহি গ্রন্থ যেমন আল-মাওয়ার্দীর 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ', ইবনে খালদুনের

‘মুকাদ্দিমা’, ইবনে তাইমিয়ার ‘আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ’ এবং আধুনিক গবেষকদের রচনাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে বর্ণনামূলক (Descriptive) ও তুলনামূলক (Comparative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা

খিলাফত সম্পর্কে বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য, প্রামাণ্য ও সুসংহত গবেষণার তুলনামূলক স্বল্পতা রয়েছে। এই গবেষণা সেই শূন্যতা পূরণে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। তবে বিষয়টির ব্যাপকতা বিবেচনায় এই সীমিত পরিসরের গবেষণায় খিলাফতের সকল দিক সমানভাবে বিশদ আলোচনার সুযোগ হয়নি; বরং মৌলিক ও অপরিহার্য বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: খেলাফত পরিচিতি

মানুষের দ্বারা জাতি গঠিত হয় আর নানান জাতির একত্রীকরণে সৃষ্টি হয় একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে চিন্তাবিদদের নানান দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ব্যক্ত করা হয়। তেমনিভাবে ইসলামি জীবনব্যবস্থা সরকার ও রাষ্ট্রকে ব্যক্ত করে তিনটি পরিভাষায়—খেলাফত, ইমামত, ইমারাত।

কুরআন-সুন্নাহয় এ তিনটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে রাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিশেরও অধিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: আমানত, ওয়ারাছাত, খেলাফত, ইমামত, বিলায়াত, ইমারাত, নিয়ামত, আহদ, রুশদ, ইজ্জাত ও কুওয়াত ইত্যাদি। সবগুলো শব্দের অর্থ একই। অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সরকার। তবে খেলাফত, ইমামত ও ইমারত—এই তিনটি পরিভাষা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

শব্দ তিনটির শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইমারত

ইমারত শব্দটি 'আমর' (أمر) ধাতু থেকে নির্গত। আল্লামা ইবনে মনযুর রহ.-এর মতে ইমারত শব্দের শাব্দিক অর্থ:

أَمَرَهُ بِهِ، يَأْمُرُ أَمْرًا وَإِمَارًا فَأْتَمَرَ أَيْ قَبِلَ أَمْرَهُ

'তাকে নির্দেশ দিয়েছে, তাকে নির্দেশ দিচ্ছে, সুতরাং সে তার নির্দেশ গ্রহণ করে নিল।'

وَالأَمِيرُ: ذُو الأَمْرِ. وَالأَمِيرُ: الآمِرُ

'আর আমির বলা হয় যিনি নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী হন।'

সুতরাং আমির মানে নির্দেশদাতা। যখন কোনো ব্যক্তি মানুষের নেতা হয়ে যায় তখন বলা হয়—

أَمَرَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ إِمَارَةً

অর্থাৎ 'লোকটি শাসক হলো, তিনি এখন শাসন করছেন।'

'মুআম্মার' (المؤمَّر) অর্থ আধিপত্য বিস্তারকারী। আর 'তাআম্মারা আলাইহিম' (تأمَّر عليهم) অর্থ তাদের উপর আধিপত্য লাভ করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, ইমারত পরিভাষাটি নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও নির্দেশদানের অধিকার বহন করে।

উলুল আমর দ্বারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আলিমগণ উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে শাসককে উলুল আমর নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, কুরআনে ইমারতের অধিকারী ব্যক্তিকে উলুল আমর বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর (কর্তৃত্বের অধিকারীদের) আনুগত্য করো।'

(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯)

ইমামত

'ইমামত' শব্দটি 'আম্ম' (أَمّ) ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ অগ্রগামী হওয়া, নেতৃত্ব দেওয়া বা সামনে থাকা। 'ইমাম' অর্থ সেই ব্যক্তি যাঁকে অনুসরণ করা হয় ও যাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া হয়। পারিভাষিক অর্থে ইমামত হলো দ্বীন ও দুনিয়ার সার্বিক নেতৃত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করা। ইমাম মাওয়ার্দী রহ. ইমামতের সংজ্ঞায় বলেন, 'ইমামত নবুওয়াতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দ্বীন রক্ষা ও পার্থিব বিষয় পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' কালামশাস্ত্র ও ফিকহশাস্ত্রে 'ইমামতে কুবরা' বলতে রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বকেই বোঝানো হয়।

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

'ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয় নবুওয়াতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দ্বীনের সংরক্ষণ ও দুনিয়ার পরিচালনার জন্য।'

(আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ)

খেলাফত

'খিলাফত' শব্দটি 'খালাফা' (خلف) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ পেছনে আসা, কারও স্থলাভিষিক্ত হওয়া বা প্রতিনিধিত্ব করা। 'খলিফা' অর্থ প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি। পারিভাষিক অর্থে খিলাফত হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরই আনীত শরিয়ত অনুযায়ী উম্মাহর দ্বীন ও দুনিয়ার সার্বিক নেতৃত্ব

পরিচালনা করা। এই কারণে খিলাফতের ধারক ব্যক্তিকে ‘খলিফা’ বলা হয়—অর্থাৎ তিনি আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত নন এই অর্থে যে তিনি ওহি লাভ করেন, বরং এই অর্থে যে তিনি রাসূলের প্রবর্তিত শরিয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন।

কুরআনে কারীমে ‘খলিফা’ ও ‘খিলাফত’ শব্দের মূল ব্যবহার লক্ষণীয়। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

‘আর স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন—আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (খলিফা) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।’

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩০)

অনুরূপভাবে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

‘হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) করেছি; অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করো।’

(সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৬)

তিন পরিভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক

খেলাফত, ইমামত ও ইমারত—এই তিনটি পরিভাষা মূলত একই বাস্তবতাকে নির্দেশ করে, তবে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বিদ্যমান। ‘খিলাফত’ পরিভাষায় গুরুত্ব দেওয়া হয় রাসূলের প্রতিনিধিত্ব ও শরিয়ত-বাস্তবায়নের দিকটির উপর; ‘ইমামত’ পরিভাষায় গুরুত্ব পায় উম্মাহর সম্মিলিত নেতৃত্ব ও অনুসরণযোগ্যতার দিকটি; আর ‘ইমারত’ পরিভাষায় প্রাধান্য পায় নির্দেশদান, কর্তৃত্ব ও শাসনিক দায়িত্বের দিকটি। ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় এদের সবগুলোই একটি কেন্দ্রীয় ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান ও তাঁর কর্তৃত্বকেই বোঝায়।

অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, খিলাফত হলো এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যার সর্বোচ্চ আইন কুরআন ও সুন্নাহ, এবং যার প্রধান দায়িত্ব হলো দ্বীনের সংরক্ষণ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে মানবকল্যাণ সাধন। এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী অধ্যায়সমূহে খিলাফতের শরঈ ভিত্তি, কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে আলোচিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: খিলাফতের শরঈ ভিত্তি

ইসলামি শাসনব্যবস্থা তথা খিলাফত কোনো মানবরচিত কল্পনা নয়; বরং এর ভিত্তি স্বয়ং শরিয়তের মূল উৎসসমূহে প্রোথিত। ইসলামি আইনশাস্ত্রে শরিয়তের চারটি প্রধান উৎস স্বীকৃত—আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। খিলাফতের বৈধতা ও আবশ্যকতা এই চারটি উৎসের প্রতিটি দ্বারা সমর্থিত। এই অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে এই উৎসসমূহের আলোকে খিলাফতের ভিত্তি বিশ্লেষণ করা হবে।

প্রথম উৎস: আল-কুরআন

পবিত্র কুরআনে বেশ কিছু আয়াতে রাষ্ট্রক্ষমতা, কর্তৃত্ব, প্রতিনিধিত্ব এবং শরিয়তের ভিত্তিতে শাসনের নির্দেশ এসেছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আয়াতটি হলো খিলাফতের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত আয়াত, যেখানে আল্লাহ তাআলা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (খিলাফত) দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন।’

(সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৫)

এই আয়াতে ‘লাইয়াসতাখলিফান্নাহুম’ শব্দটি ‘খিলাফত’ ধাতু থেকে নির্গত, যা প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য পৃথিবীতে কর্তৃত্ব ও শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মুফাসসিরগণ এই আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ করেছেন যে, এই প্রতিশ্রুতি খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

অনুরূপভাবে ন্যায়ের ভিত্তিতে শাসন ও আমানত যথাস্থানে অর্পণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দিতে এবং মানুষের মধ্যে যখন বিচার করবে, তখন ন্যায়ের সাথে বিচার করতে।’

(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

আলিমগণ এই আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন যে, ক্ষমতা ও দায়িত্ব একটি 'আমানত'; তা যোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা এবং তার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ফরয। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এমন একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক যা আমানত রক্ষা করবে ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে—আর সেটিই খিলাফতের মূল লক্ষ্য। শরিয়ত অনুযায়ী শাসন পরিচালনার সুস্পষ্ট নির্দেশও কুরআনে এসেছে—

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

'আর আপনি তাদের মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।'

(সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৪৯)

দ্বিতীয় উৎস: সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিসে নেতৃত্ব, আনুগত্য ও জামাতবদ্ধতার গুরুত্ব এবং নেতৃত্বহীন অবস্থার ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হাদিসটিতে নেতার প্রতি বায়আতের আবশ্যকতা সম্পর্কে নবীজি বলেন—

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে তার ঘাড়ে (বৈধ ইমামের প্রতি) কোনো বায়আত নেই, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।'

(সহিহ মুসলিম)

এই হাদিস থেকে আলিমগণ দলিল গ্রহণ করেছেন যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একজন বৈধ ইমাম বা খলিফার আনুগত্যে থাকা আবশ্যক, যা সম্ভব হয় কেবল একটি প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের অধীনেই। অনুরূপভাবে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব-পরম্পরা প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ

'বনী ইসরাঈলকে নবীগণ পরিচালনা করতেন; যখনই একজন নবী মারা যেতেন, আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই, বরং খলিফাগণ আসবেন এবং তাঁদের সংখ্যা হবে অনেক।'

(সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)

এই হাদিসটি খিলাফতের অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতার সরাসরি ভবিষ্যদ্বাণী এবং নবী-পরবর্তী উম্মাহর নেতৃত্বের রূপরেখা নির্দেশ করে। এ ছাড়াও দায়িত্বশীলতার নীতি সম্পর্কে নবীজি বলেছেন—

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল (রাখাল) এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল এবং তিনি তাঁর প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।'

(সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)

খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ

খিলাফতের পর্যায়সমূহ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহর শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিক রূপান্তরের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি নবুওয়াত, নবুওয়াতের আদর্শে খিলাফত, রাজতন্ত্র এবং অবশেষে পুনরায় নবুওয়াতের আদর্শে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনই হলো 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' তথা নবুওয়াতের আদর্শভিত্তিক খিলাফতের আদর্শ মানদণ্ড।

(মুসনাদে আহমাদ; হাদিসটি হাফিজ ইবনে রজব রহ. ও অন্যান্য মুহাদ্দিস কর্তৃক হাসান/সহিহ বিবেচিত)

তৃতীয় উৎস: ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত)

খিলাফত প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে—এটি ইসলামি আইনশাস্ত্রে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম এমনকি তাঁর দাফনের পূর্বেই সাকীফায়ে বনী সাইদায় সমবেত হয়ে খলিফা নির্বাচনকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ইমাম

নববী রহ. ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে, মুসলিম উম্মাহর জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করা ফরয।

ইমাম মাওয়ার্দী রহ. ও ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি রহ. সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, উম্মাহর উপর ইমাম প্রতিষ্ঠা করা ফরযে কিফায়া—যদি কেউ এই দায়িত্ব পালন করে তবে অন্যদের থেকে আবশ্যকতা রহিত হয়, কিন্তু কেউই পালন না করলে সমস্ত উম্মাহ গুনাহগার হয়। ইবনে খালদুন রহ. 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে এই ইজমাকে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করে বলেছেন, ইমাম নিযুক্তির আবশ্যকতা শরিয়ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনা দ্বারা নয়।

চতুর্থ উৎস: কিয়াস ও যুক্তি

শরিয়তের লক্ষ্য (মাকাসিদুশ শরিয়াহ) হলো দ্বীন, জীবন, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ—এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণ একটি সংগঠিত কর্তৃপক্ষ ব্যতীত সম্ভব নয়। জিহাদ পরিচালনা, হদ ও শাস্তি কার্যকর করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় ও বণ্টন, সীমান্ত সুরক্ষা—এই সকল শরঈ দায়িত্ব একজন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ তথা খলিফা ব্যতীত পালন করা অসম্ভব। উসুলশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ নীতি অনুযায়ী, 'যা ব্যতীত কোনো ফরয পূর্ণ হয় না, তা-ও ফরয।' অতএব খিলাফত প্রতিষ্ঠা শরঈ ও বুদ্ধিবৃত্তিক—উভয় বিবেচনায়ই আবশ্যক।

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

'যে বিষয় ব্যতীত কোনো ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেই বিষয়টিও ওয়াজিব।'

(উসুলে ফিকহের সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি)

তৃতীয় অধ্যায়: খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিধান ও গুরুত্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে খিলাফতের শরঈ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার শরঈ বিধান (হুকম) এবং উম্মাহর জীবনে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হবে। ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবে খিলাফত তথা ইমামত প্রতিষ্ঠাকে আবশ্যক (ওয়াজিব) বলে অভিহিত করেছেন, যদিও এই আবশ্যকতার প্রকৃতি নিয়ে কিছু সূক্ষ্ম মতপার্থক্য বিদ্যমান।

খিলাফত প্রতিষ্ঠা: ফরযে কিফায়া

জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলিমের মতে খিলাফত বা ইমাম প্রতিষ্ঠা করা উম্মাহর উপর ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ এটি এমন একটি দায়িত্ব যা সমষ্টিগতভাবে উম্মাহর উপর বর্তায়; যদি সক্ষম একদল লোক এই দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করে তবে বাকিদের থেকে দায়মুক্তি ঘটে, কিন্তু কেউই তা আদায় না করলে সক্ষম সকলেই গুনাহগার হয়। ইমাম মাওয়ার্দী রহ. 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ' গ্রন্থের সূচনাতেই এই বিধান স্পষ্ট করেছেন।

ইমাম গাযালী রহ. 'আল-ইক্তিসাদ ফিল ই'তিকাদ' গ্রন্থে বলেন, দ্বীন ও দুনিয়ার শৃঙ্খলা নেতৃত্ব ব্যতীত অসম্ভব; আর যা ব্যতীত দ্বীন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, তা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। তিনি আরও বলেন, 'দ্বীন হলো ভিত্তি আর কর্তৃত্ব হলো রক্ষক; যে বিষয়ের ভিত্তি নেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত, আর যার রক্ষক নেই তা বিনষ্ট।'

'দ্বীন ও কর্তৃত্ব যমজ ভাইয়ের ন্যায়; দ্বীন মূল আর কর্তৃত্ব রক্ষক। যার মূল নেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত, আর যার রক্ষক নেই তা বিলুপ্ত।' —ইমাম গাযালী রহ.

মতপার্থক্যের পর্যালোচনা

খিলাফত প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার উৎস নিয়ে মূলত তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথম মত—জমহুর আহলুস সুন্নাহ ও মু'তাযিলাদের অধিকাংশের মতে এর আবশ্যকতা শরিয়ত (নকল) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় মত—কতিপয় মু'তাযিলা ও দার্শনিকের মতে এর আবশ্যকতা বুদ্ধি (আকল) দ্বারা প্রমাণিত, কেননা বিশৃঙ্খলা রোধ ও কল্যাণ সাধনে নেতৃত্ব অপরিহার্য। তৃতীয় মত—অতি অল্পসংখ্যক গোষ্ঠী (যেমন কিছু খারিজি) ইমাম প্রতিষ্ঠাকে আবশ্যক মনে করত না। তবে আহলুস সুন্নাহর প্রামাণ্য অবস্থান হলো, শরিয়ত ও বুদ্ধি উভয় বিবেচনায়ই খিলাফত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক, এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এই অবস্থানকে চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

খিলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

খিলাফতের গুরুত্ব কেবল রাজনৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের অপরিহার্য মাধ্যম। নিম্নলিখিত দিকসমূহে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়। প্রথমত, দ্বীনের সংরক্ষণ ও বিদ'আত প্রতিরোধ একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই কার্যকরভাবে সম্ভব। দ্বিতীয়ত, শরঈ শাস্তি (হুদুদ) প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যতীত অসম্ভব। তৃতীয়ত, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বহিঃশত্রু থেকে উম্মাহর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সামরিক ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন। চতুর্থত, যাকাত আদায়-বণ্টন, বায়তুল মাল পরিচালনা ও দরিদ্রের অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

পঞ্চমত, ইসলামের দাওয়াত বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেওয়া ও মজলুমদের সাহায্য করা একটি সংগঠিত উম্মাহর সম্মিলিত শক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। ষষ্ঠত, উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং বিভাজন প্রতিরোধে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অপরিহার্য। এই সকল কারণে ইসলামি চিন্তাবিদগণ খিলাফতকে কেবল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং দ্বীন বাস্তবায়নের অপরিহার্য কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়: খলিফার যোগ্যতা, নির্বাচন ও বায়আত

খিলাফত একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদ; এই পদের অধিকারীর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা ও গুণ থাকা শরিয়ত আবশ্যক করেছে। একইসাথে খলিফা নির্বাচনের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ইসলামি ইতিহাস ও ফিকহশাস্ত্রে স্বীকৃত। এই অধ্যায়ে খলিফার যোগ্যতা, নির্বাচনপদ্ধতি ও বায়আতের তাৎপর্য আলোচিত হবে।

খলিফার যোগ্যতা ও শর্তাবলি

ইমাম মাওয়ার্দী রহ. খলিফার জন্য সাতটি প্রধান শর্ত উল্লেখ করেছেন। প্রথম শর্ত—ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) তার সকল শর্তসহ। দ্বিতীয় শর্ত—ইজতিহাদ করার যোগ্য পর্যায়ের ইলম, যাতে তিনি শরঈ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। তৃতীয় শর্ত—দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাকশক্তিসহ সুস্থ ইন্দ্রিয়। চতুর্থ শর্ত—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থতা, যা দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি না করে। পঞ্চম শর্ত—প্রজ্ঞা ও সুষ্ঠু রাষ্ট্রপরিচালনার যোগ্যতা। ষষ্ঠ শর্ত—শত্রুর মোকাবিলা ও জিহাদ পরিচালনার সাহস ও দৃঢ়তা। সপ্তম শর্ত—কুরাইশ বংশভুক্ত হওয়া (এ শর্তটি নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে)।

এ ছাড়া সর্বসম্মত মৌলিক শর্তসমূহ হলো—মুসলিম হওয়া, পুরুষ হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান (আকিল-বালিগ) হওয়া এবং স্বাধীন হওয়া। কুরাইশ-বংশের শর্ত প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস উদ্ধৃত হয়—

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

‘ইমামগণ (নেতৃবৃন্দ) কুরাইশ থেকে হবেন।’

(মুসনাদে আহমাদ; অনুরূপ বর্ণনা একাধিক সূত্রে বর্ণিত)

তবে আধুনিক অনেক গবেষক, যেমন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. ও পরবর্তী আলিমগণ মনে করেন, কুরাইশ-শর্তটি ছিল মূলত সেই যুগের আরব সমাজে নেতৃত্বের স্বাভাবিক যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত একটি অগ্রাধিকার, এটি চিরস্থায়ী অপরিহার্য শর্ত নয়। মূল গুরুত্ব হলো যোগ্যতা, তাকওয়া ও উম্মাহর গ্রহণযোগ্যতা।

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি

ইসলামি ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে খলিফা নির্বাচনের একাধিক বৈধ পদ্ধতি প্রতিফলিত হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো থেকে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ খিলাফত প্রতিষ্ঠার বৈধ পন্থাসমূহ নির্ধারণ করেছেন।

এক. আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ-এর নির্বাচন

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বলতে উম্মাহর সেই প্রতিনিধিস্থানীয় বিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে বোঝায় যাঁরা খলিফা নির্বাচন ও অপসারণের অধিকার রাখেন—যেমন আলিম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর খিলাফত এই পদ্ধতিতে সাকীফায়ে বনী সাইদায় সম্পন্ন হয়, যেখানে উপস্থিত সাহাবিগণ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে সাধারণ মুসলিমগণ তা সমর্থন করেন।

দুই. পূর্ববর্তী খলিফার মনোনয়ন (ইসতিখলাফ)

হযরত আবু বকর রা. ওফাতের পূর্বে সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে হযরত উমর রা.-কে খলিফা মনোনীত করেন এবং উম্মাহ তা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যোগ্য উত্তরসূরির মনোনয়ন একটি বৈধ পদ্ধতি, যদি তা উম্মাহর স্বার্থে ও পরামর্শভিত্তিক হয় এবং উম্মাহর বায়আত দ্বারা সমর্থিত হয়।

তিন. শূরা কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন

হযরত উমর রা. ওফাতের পূর্বে ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবির সমন্বয়ে একটি শূরা কমিটি গঠন করেন এবং তাঁদের উপর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই কমিটির পরামর্শ ও জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে হযরত উসমান রা. খলিফা নির্বাচিত

হন। এটি প্রমাণ করে যে, একটি নির্বাচক পরিষদের মাধ্যমে পরামর্শভিত্তিক নির্বাচন ইসলামসম্মত পদ্ধতি।

বায়আত: কর্তৃত্বের শরঈ ভিত্তি

'বায়আত' অর্থ আনুগত্যের অঙ্গীকার বা শপথ। খিলাফতের ক্ষেত্রে বায়আত হলো খলিফা ও উম্মাহর মধ্যকার একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যেখানে উম্মাহ খলিফার শরিয়তসম্মত নির্দেশের আনুগত্যের অঙ্গীকার করে এবং খলিফা শরিয়ত অনুযায়ী ন্যায়বিচার ও উম্মাহর কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বায়আতের মাধ্যমেই খলিফার কর্তৃত্ব বৈধতা লাভ করে। তবে এই আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ—তা কেবল শরিয়তের সীমার মধ্যেই প্রযোজ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।'

(মুসনাদে আহমাদ)

এই নীতিটি ইসলামি শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে—কর্তৃত্ব শর্তহীন ও স্বেচ্ছাচারী নয়, বরং তা শরিয়তের অধীন ও জবাবদিহিমূলক। খলিফা যদি স্পষ্ট কুফরি বা শরিয়তবিরোধী কাজে নির্দেশ দেন, তবে সেই নির্দেশ পালন নিষিদ্ধ।

পঞ্চম অধ্যায়: খুলাফায়ে রাশেদীন — আদর্শ খিলাফতের নমুনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর যে চারজন বিশিষ্ট সাহাবি পর্যায়ক্রমে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরা ইতিহাসে ‘খুলাফায়ে রাশেদীন’ (সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফাগণ) নামে পরিচিত। তাঁদের শাসনকাল প্রায় ত্রিশ বছর (১১–৪০ হিজরি) স্থায়ী হয় এবং এই সময়কেই ‘খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’ তথা নবুওয়াতের আদর্শভিত্তিক খিলাফতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

‘তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরবর্তী সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো; তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখো (অর্থাৎ মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকো)।’

(সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিযি; ইমাম তিরমিযি একে হাসান-সহিহ বলেছেন)

প্রথম খলিফা: হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. (শাসনকাল ১১–১৩ হিজরি) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবি ও প্রথম খলিফা। তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনকালেই তিনি অসামান্য দৃঢ়তার পরিচয় দেন। তাঁর শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল ‘রিদ্দা যুদ্ধ’—ভণ্ড নবী ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে ইসলামি রাষ্ট্রের ঐক্য ও কর্তৃত্ব সংরক্ষণ। তিনিই কুরআন সংকলনের প্রক্রিয়া সূচনা করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি জবাবদিহিমূলক শাসনের আদর্শ স্থাপন করেন।

‘আমাকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আমি যদি ভালো কাজ করি তবে আমাকে সহযোগিতা করো, আর যদি ভুল করি তবে আমাকে সংশোধন করো। ... আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করো; আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই তবে আমার আনুগত্য তোমাদের উপর আবশ্যক নয়।’ —হযরত আবু বকর রা.-এর অভিষেক ভাষণ

খুলাফায়ে রাশেদীনের সূচনাবিন্দু হিসেবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর জীবন ও কর্ম বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। তাঁর জীবনচরিত খিলাফতের আদর্শিক ভিত্তি, রাষ্ট্রনায়কের চারিত্রিক মান এবং ইসলামি নেতৃত্বের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। নিম্নে শাইখ মাহমুদ শাকিরের 'চার খলীফা' গ্রন্থের আলোকে তাঁর জীবনের প্রধান পর্বগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বংশ পরিচয়, জন্ম ও উপাধি

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ। তাঁর বংশধারা: আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কাব বিন সাদ বিন তাইম। তাঁর পিতার উপনাম ছিল আবু কুহাফা এবং মাতার নাম উম্মুল খাইর সালমা বিনতে সখর; মাতাও বনু তাইম গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং সম্পর্কে তিনি ছিলেন তাঁর পিতার চাচাতো বোন। বনু তাইম ছিল কুরাইশের অন্যতম একটি শাখাগোত্র; তবে মর্যাদা ও প্রভাবের দিক থেকে এটি বনু আবদে মানাফ কিংবা বনু মাখজুমের মতো অতটা শক্তিশালী ছিল না।
তিনি 'আতিক' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে 'সিদ্দিক' (পরম সত্যবাদী ও সত্য-সমর্থনকারী) নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন—কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সংবাদকে তিনি বিনা দ্বিধায় সত্য বলে গ্রহণ করতেন। জন্মের দিক থেকে তিনি হিজরতের প্রায় একান্ন বছর পূর্বে ভূমিষ্ঠ হন; এ হিসাবে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আনুমানিক দুই বছর কয়েক মাসের ছোটো ছিলেন।

জাহিলী যুগে আবু বকর রা.-এর মর্যাদা ও দায়িত্ব

ইসলামপূর্ব যুগেও আবু বকর রা. কুরাইশ সমাজে একজন সম্মানিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সে সময় কুরাইশদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মূলত দশটি গোত্রের দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল, যাঁদের প্রত্যেকের ওপর নির্দিষ্ট একটি জাতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এ ব্যবস্থায় আবু বকর রা.-এর দায়িত্ব ছিল 'দিয়াত' তথা রক্তপণ ও ঋণ

সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনা। মানুষ তাঁর সততার ওপর এতটাই আস্থাশীল ছিল যে তারা ঋণ ও আমানতের অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত, এবং কোনো বিষয়ে তিনি মত দিলে কুরাইশরা তা নির্দ্বিধায় সত্য বলে মেনে নিত।

গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে কুরাইশের সেই দশজন দায়িত্বশীল নেতার তালিকা উল্লেখ করেছেন—যেমন: আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কাছে ছিল হাজীদের পানি সরবরাহের (সিকায়া) দায়িত্ব, আবু সুফিয়ান বিন হারবের হাতে ছিল কুরাইশের যুদ্ধপতাকা, হারিস বিন আমেরের ওপর ছিল হাজীদের জন্য সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যয়ের ভার, উসমান বিন তালহার কাছে ছিল কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, ইয়াযীদ বিন জামআর হাতে ছিল পরামর্শসভার দায়িত্ব, খালিদ বিন ওয়ালিদের ওপর ছিল যুদ্ধসরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা এবং উমর বিন খাত্তাবের কাছে ছিল দূতিয়ালি বা রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব। এ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই আবু বকর রা. কুরাইশের নেতৃস্থানীয় মহলে একটি সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

আবু বকর রা.-এর সৎস্বভাব, বিশ্বস্ততা ও পরিচ্ছন্ন চরিত্রই তাঁকে আসমানি রিসালাত গ্রহণের যোগ্য করে তুলেছিল। তদুপরি তিনি হানিফ তথা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে আগেই শুনতে পেয়েছিলেন যে শীঘ্রই একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। ইবনে আসাকির বর্ণিত একটি বিবরণে এসেছে, একদিন তিনি কাবার পাশে বসে ছিলেন; সেখানে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইলও উপস্থিত ছিলেন। উমাইয়া বিন আবি সালত পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কথাবার্তায় আসন্ন নবীর প্রসঙ্গ ওঠে।

এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে আবু বকর রা. ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে যান, যিনি অধিকাংশ সময় আসমানের দিকে তাকিয়ে চিন্তামগ্ন থাকতেন এবং কিতাবের জ্ঞান রাখতেন। ওয়ারাকা তাঁকে জানান, প্রতীক্ষিত নবী আরবের মধ্যম বংশীয় ধারা থেকে আবির্ভূত হবেন এবং আবু বকরের গোত্রও আরবদের মধ্যে মধ্যম বংশীয়। নবী কী বলবেন—এ প্রশ্নের উত্তরে ওয়ারাকা বলেন, তাঁকে যা আদেশ করা হবে তিনি তাই বলবেন এবং তিনি কখনো জুলুম বা অন্যায়ের আশ্রয় নেবেন না। এ ধরনের পূর্বাভাস

আবু বকর রা.-এর অন্তরে সত্যের প্রতি প্রস্তুতি তৈরি করে রেখেছিল, ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত পাওয়ামাত্র তিনি বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

পারিবারিক জীবন

জাহিলী যুগে আবু বকর রা. দুজন নারীকে বিবাহ করেন। প্রথমজন কুতাইলা বিনতে আবদুল উজ্জা, যাঁর গর্ভে আব্দুল্লাহ ও আসমা রা. জন্মগ্রহণ করেন; দ্বিতীয়জন উম্মে রোমান বিনতে আমির, যাঁর গর্ভে আবদুর রহমান ও উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. জন্ম নেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আনসারি নারী হাবিবা বিনতে খারিজাকে বিবাহ করেন; তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুম আবু বকর রা.-এর ইন্তিকালের পর ভূমিষ্ঠ হন।
পরবর্তীতে তিনি আসমা বিনতে উমাইসকে বিবাহ করেন, যিনি ইতঃপূর্বে জাফর বিন আবি তালিব রা.-এর স্ত্রী ছিলেন; জাফর রা. মুতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। আসমা বিনতে উমাইসের গর্ভে হিজরতের দশম বছরে মুহাম্মদ বিন আবি বকর জন্মগ্রহণ করেন। আবু বকর রা.-এর ইন্তিকালের পর আসমা বিনতে উমাইস হযরত আলী রা.-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

খিলাফতের দায়িত্বে বাইআত: সাকিফার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর খিলাফতের প্রশ্নটি সামনে আসে। মদিনার আনসারগণ প্রাথমিকভাবে মনে করেছিলেন, যেহেতু তাঁরা মদিনার আদি অধিবাসী এবং ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁদেরই অগ্রণী ভূমিকা ছিল, তাই খলিফা তাঁদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হওয়া উচিত। তাঁরা যুক্তি দিতেন যে, তাঁরা রাসূলকে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়েছেন, মুহাজিরদের জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি উন্মুক্ত করেছেন এবং প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ত্যাগ স্বীকার করেছেন।
অন্যদিকে আনসারদের একটি আশঙ্কা ছিল যে, রাসূলের ওফাতের পর মুহাজিরগণ হয়তো মদিনা ছেড়ে নিজেদের আদি ভূমি মক্কায় ফিরে যাবেন—কারণ মক্কা তখন

ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছিল। উল্লেখ্য, এ ধরনের আশঙ্কা আনসারদের মনে অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময়ও দেখা দিয়েছিল, যখন হুনাইন যুদ্ধের পর হাওয়াজিন ও বনু সাকিফ থেকে প্রাপ্ত গনিমত বণ্টন নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই সাকিফায়ে বনু সাইদায় আলোচনার সূত্রপাত হয়, যেখানে শেষ পর্যন্ত মুহাজির ও আনসারগণের ঐকমত্যে আবু বকর রা.-এর হাতে বাইআত গৃহীত হয় এবং তিনি প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন।

খিলাফতকালের কর্মতৎপরতা ও বিজয়সমূহ

আবু বকর রা.-এর খিলাফতকাল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—মাত্র দুই বছর তিন মাস দশ দিন। কিন্তু এই স্বল্প সময়েই তিনি এমন সব বিশাল কীর্তি সম্পন্ন করেন, যা সম্পাদন করতে অন্যদের হয়তো বহু বছর লেগে যেত। তিনি ছিলেন বিশ্বাস ও আদর্শে আপোসহীন; ইসলাম তাঁর হৃদয়ে অটল পাথরের মতো দৃঢ়ভাবে স্থান করে নিয়েছিল। এ কারণেই তাঁকে ইসলামের সর্বাধিক সুদৃঢ়, পরিচ্ছন্ন ও সঠিকবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বরূপে গণ্য করা হয়।

তাঁর শাসনামলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি ছিল রিদ্দা তথা ধর্মত্যাগ ও ভণ্ড নবুওয়াত দাবিদারদের ফিতনা দমন এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা। অনেক বেদুইন আরব ইসলাম গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু ঈমান তখনো তাদের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করেনি। মহান আল্লাহ এ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

‘মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলো, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি—কেননা ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মফল থেকে কিছুমাত্র কমাবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

(সূরা আল-হুজুরাত: ১৪)

মুনাফিকি ও দ্বিধাগ্রস্ততার এই প্রবণতা সম্পর্কে কুরআন আরও স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছে। মরুবাসীদের একটি অংশের কুফর ও কপটতার গভীরতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'মরুবাসীরা কুফর ও কপটতায় অধিকতর কঠোর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাই তাদের অধিক স্বভাবসঙ্গত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

(সূরা আত-তাওবা: ৯৭)

এ প্রেক্ষাপটে আবু বকর রা.-এর দূরদর্শী ও আপোসহীন নেতৃত্ব ইসলামের ভিত্তিকে নড়বড়ে হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং পরবর্তী বিজয়ের পথ সুগম করে। তাঁরই সময়ে ইরাক ও সিরিয়ার দিকে ইসলামি বাহিনীর অভিযান সূচিত হয়, যা পরবর্তীতে উমর রা.-এর শাসনামলে বিশাল বিজয়ে রূপ নেয়।

অসীয়ত (উপদেশ) ও ইন্তিকাল

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. বর্ণনা করেন, আবু বকর রা. শেষ রোগে শয্যাশায়ী অবস্থায় বলেছিলেন—'আমরা যখন মুসলিমদের শাসনভার গ্রহণ করেছি, তখন তাদের সম্পদ থেকে কোনো দিনার বা দিরহাম গ্রহণ করিনি; বরং তাদের সাদাসিধে খাদ্য খেয়েছি ও সাধারণ পোশাক পরেছি।' তিনি অসিয়ত করেন যে, আমিরশাহির দায়িত্বে আসার পর তাঁর যে সম্পদ বেড়েছে, তা যেন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফিরিয়ে দিয়ে পরবর্তী খলিফা উমর রা.-এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়; কারণ তাতে তাঁর কোনো হক নেই বলে তিনি মনে করতেন।

তাঁর অসীয়তের মূল বিষয়গুলো ছিল: তাঁর অবশিষ্ট সম্পদ বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেওয়া; খিলাফতকালে বায়তুল মাল থেকে গৃহীত ভাতার বিনিময়ে নিজের একটি বাগান রাষ্ট্রকে দান করা; এবং তাঁকে যেন তাঁর ব্যবহৃত পুরোনো দুটি কাপড় ধুয়ে কাফন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কেউ যখন বললেন, নতুন কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে, তখন তিনি বলেছিলেন—জীবিত মানুষ নতুন কাপড়ের অধিক হকদার; মৃত মানুষের জন্য পুরোনো কাপড়ই যথেষ্ট। তিনি আরও অসিয়ত করেন যে, তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে

উমাইস তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরাবেন এবং তাঁকে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশেই সমাহিত করা হয়।

তাঁর ইন্তিকালের পর পরিবার তাঁর রেখে যাওয়া সামান্য সম্পদ—একটি দাস, একটি পানি-বহনকারী উট এবং একটি পুরোনো চাদর—খলিফা উমর রা.-এর কাছে পাঠিয়ে দেয়। তা দেখে উমর রা. অশ্রুসিক্ত হয়ে বলেছিলেন: 'আল্লাহ আবু বকরকে রহম করুন; তিনি তাঁর পরবর্তীদের জন্য অনুসরণের এক কঠিন মানদণ্ড রেখে গেছেন।' এই সরলতা, নিরাসক্তি ও আমানতদারিতা আদর্শ খিলাফতের নৈতিক ভিত্তিকে চিরকালের জন্য আলোকিত করে রেখেছে।

দ্বিতীয় খলিফা: হযরত উমর ফারুক রা.

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (শাসনকাল ১৩–২৩ হিজরি) ছিলেন ন্যায়বিচারের প্রতীক ও ইসলামি রাষ্ট্রকাঠামোর প্রকৃত স্থপতি। তাঁর শাসনামলে ইসলামি সাম্রাজ্য পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও ইরাকসহ বিশাল অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়—তিনি প্রতিষ্ঠা করেন প্রাদেশিক প্রশাসন, বিচার বিভাগ (পৃথক কাজি নিয়োগ), বায়তুল মাল, হিজরি সন গণনা, ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা এবং পুলিশ ও সামরিক ছাউনি ব্যবস্থা। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রবাদপ্রতিম; তিনি বলতেন, 'ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি অভুক্ত মারা যায়, আমি আশঙ্কা করি আল্লাহ আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।'

হযরত উমর রা.-এর শাসনব্যবস্থায় শূরা বা পরামর্শের নীতি, জবাবদিহিতা, গভর্নরদের সম্পদের হিসাব গ্রহণ এবং সাধারণ প্রজার সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর শাসনকালকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রায়োগিক আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তৃতীয় খলিফা: হযরত উসমান ইবনে আফফান রা.

হযরত উসমান রা. (শাসনকাল ২৩–৩৫ হিজরি) ছিলেন উদারতা ও দানশীলতার প্রতীক, যাঁকে 'যুন-নুরাইন' (দুই জ্যোতির অধিকারী) উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর শাসনামলের সবচেয়ে স্মরণীয় অবদান হলো কুরআনের একক প্রামাণ্য সংস্করণ (মুসহাফে উসমানি) প্রস্তুত করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রেরণ, যা কুরআনের পাঠগত ঐক্য চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করেছে। তাঁর সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয় এবং প্রথম নৌবাহিনী গঠিত হয়। তবে তাঁর শাসনের শেষভাগে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দেয় এবং বিদ্রোহীদের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন—যা ইসলামি ইতিহাসে 'ফিতনার' সূচনা করে।

চতুর্থ খলিফা: হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রা.

হযরত আলী রা. (শাসনকাল ৩৫–৪০ হিজরি) ছিলেন জ্ঞান, বীরত্ব ও তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক। তাঁর শাসনকাল ছিল গৃহযুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ ফিতনায় পরিপূর্ণ—জঙ্গে জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধ এই সময়েই সংঘটিত হয়। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি ন্যায়বিচার ও শরিয়তের প্রতি আপসহীন থেকেছেন। তাঁর শাসননীতি, বিচারিক প্রজ্ঞা ও গভর্নরদের প্রতি লিখিত নির্দেশনা (যেমন মিসরের গভর্নর মালিক আশতারের প্রতি তাঁর প্রসিদ্ধ পত্র) ইসলামি রাষ্ট্রনীতির এক অমূল্য দলিল। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে খিলাফতে রাশিদার আদর্শ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থায় কয়েকটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা একে আদর্শ খিলাফতের মানদণ্ডে উন্নীত করেছে। প্রথমত, কুরআন ও সুন্নাহর কর্তৃত্বের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য। দ্বিতীয়ত, শূরা তথা পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ। তৃতীয়ত, ন্যায়বিচারে শাসক-প্রজা, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমতা। চতুর্থত, খলিফার পূর্ণ জবাবদিহিতা ও সরল-সাদাসিধে জীবনযাপন। পঞ্চমত, বায়তুল মালকে জনগণের

আমানত হিসেবে বিবেচনা ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা। ষষ্ঠত, সমালোচনা গ্রহণ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা। এই বৈশিষ্ট্যসমূহই খিলাফতকে রাজতন্ত্র ও স্বৈরশাসন থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: খিলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পর ইসলামি শাসনব্যবস্থায় একটি গুণগত রূপান্তর ঘটে। হযরত আলী রা.-এর শাহাদাত ও পরবর্তীতে উমাইয়া শাসনের সূচনার মাধ্যমে খিলাফত ক্রমে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের (মুলুকিয়াত) দিকে ধাবিত হয়। এই অধ্যায়ে খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য এবং পরবর্তী ইসলামি সাম্রাজ্যসমূহের শাসনচরিত্র আলোচিত হবে।

খিলাফত ও মুলুকিয়াতের মৌলিক পার্থক্য

খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে—খিলাফতে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর, খলিফা কেবল তাঁর শরিয়তের বাস্তবায়নকারী; পক্ষান্তরে রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছাই আইন। ক্ষমতা-হস্তান্তরের প্রশ্নে—খিলাফতে নির্বাচন, শূরা ও বায়আতের ভিত্তিতে যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচিত হন; রাজতন্ত্রে ক্ষমতা বংশানুক্রমিকভাবে হস্তান্তরিত হয়। জবাবদিহিতার প্রশ্নে—খলিফা আল্লাহ ও উম্মাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন; রাজা সাধারণত জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে। লক্ষ্যের প্রশ্নে—খিলাফতের লক্ষ্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ; রাজতন্ত্রের লক্ষ্য প্রায়শ ক্ষমতা ও বংশের স্বার্থরক্ষা।

আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. ‘মুকাদ্দিমা’ গ্রন্থে এই রূপান্তরকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ‘আসাবিয়্যাহ’ (গোষ্ঠীগত সংহতি) ও ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রবণতা খিলাফতকে ক্রমে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করে। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, শরঈ আদর্শ অনুযায়ী প্রকৃত খিলাফত হলো সেই ব্যবস্থা যা শরিয়তের ভিত্তিতে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করে।

আধুনিক যুগে সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদুদী তাঁর 'খিলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে এই পার্থক্য বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে শূরাভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক ও আইনের শাসনভিত্তিক খিলাফত ক্রমে স্বৈর ও বংশানুক্রমিক শাসনে রূপ নেয়।

পরবর্তী ইসলামি সাম্রাজ্যসমূহ

উমাইয়া খিলাফত (৪১–১৩২ হি.)

মুয়াবিয়া রা.-এর মাধ্যমে দামেস্ককেন্দ্রিক উমাইয়া শাসনের সূচনা হয়। এই যুগে ইসলামি সাম্রাজ্য স্পেন থেকে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। তবে ক্ষমতা বংশানুক্রমিক হওয়ায় এ যুগে খিলাফতের আদর্শিক চরিত্রে পরিবর্তন আসে। উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর সংক্ষিপ্ত শাসনকালকে এই যুগের ব্যতিক্রম ও 'পঞ্চম খলিফায়ে রাশিদ' হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

আব্বাসীয় খিলাফত (১৩২–৬৫৬ হি.)

বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসীয় খিলাফতের যুগকে ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময় 'বাইতুল হিকমা'র মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা ও অনুবাদকর্মে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদসহ চার মাযহাবের ইমামগণ এবং বুখারী-মুসলিমসহ মহান মুহাদ্দিসগণ এই যুগেই আবির্ভূত হন। তবে রাজনৈতিকভাবে পরবর্তীকালে খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদের পতনের মাধ্যমে আব্বাসীয় খিলাফতের কার্যকর সমাপ্তি ঘটে।

উসমানীয় খিলাফত (৬৯৯–১৩৪২ হি. / ১২৯৯–১৯২৪ খ্রি.)

তুরস্ককেন্দ্রিক উসমানীয় খিলাফত ছিল ইতিহাসের সর্বশেষ বৃহৎ ও কার্যকর খিলাফত। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল বিজয় এই সাম্রাজ্যের অন্যতম গৌরবময় অধ্যায়। প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে এই খিলাফত তিন মহাদেশে বিস্তৃত থেকে মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসেবে টিকে ছিল। তবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অভ্যন্তরীণ

দুর্বলতা, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক চাপ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে এটি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়: খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

ইসলামি খিলাফত কেবল একজন খলিফার ব্যক্তিগত শাসন নয়; বরং এটি একটি সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যেখানে বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান পরস্পর সম্পূরক হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এই অধ্যায়ে খিলাফত রাষ্ট্রের মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আলোচিত হবে।

শূরা — পরামর্শ পরিষদ

শূরা তথা পরামর্শ ইসলামি শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক স্তম্ভ। খলিফা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ ও বিজ্ঞজনদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য। কুরআনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে—

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

‘এবং তাদের কার্যাবলি পরিচালিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।’

(সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও পরামর্শের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন—

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

‘এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।’

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৫৯)

বিচার বিভাগ (কাযা)

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ খিলাফত রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কাজি (বিচারক) শরিয়ত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি খলিফার প্রভাবমুক্ত। হযরত উমর রা. কাজিদের নিয়োগ ও বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে আবু মূসা আশ‘আরী রা.-কে যে প্রসিদ্ধ পত্র লিখেছিলেন, তা ইসলামি বিচারনীতির এক মৌলিক দলিল। ইসলামি বিচারব্যবস্থায় শাসক ও সাধারণ প্রজা আইনের দৃষ্টিতে সমান—এমনকি খলিফা নিজেও আদালতে সাধারণ নাগরিকের মতোই বিচার্য।

বায়তুল মাল — রাষ্ট্রীয় কোষাগার

বায়তুল মাল হলো খিলাফত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কোষাগার, যা যাকাত, উশর, খারাজ, জিযিয়া, গনিমত ও ফাই-সহ বিভিন্ন বৈধ উৎস থেকে রাষ্ট্রীয় আয় সংগ্রহ ও তা শরিয়তসম্মত খাতে ব্যয় নিশ্চিত করে। বায়তুল মালকে জনগণের আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়; খলিফার এর উপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, বরং তিনি কেবল

একজন আমানতদার তত্ত্বাবধায়ক। দরিদ্র, এতিম, মুসাফির ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার এই কোষাগার থেকে নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

হিসবা — সামাজিক তদারকি প্রতিষ্ঠান

হিসবা হলো ‘আমর বিল মা‘রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার’ (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ) নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। মুহতাসিব (হিসবা কর্মকর্তা) বাজার তদারকি, ওজন-পরিমাপের সততা, মূল্য-ন্যায্যতা, জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক নৈতিকতা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। এটি একটি নৈতিক-অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজে শৃঙ্খলা ও ন্যায্যতা বজায় রাখে।

প্রাদেশিক প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগ

খিলাফত রাষ্ট্রের বিশাল ভূখণ্ড পরিচালনার জন্য প্রদেশভিত্তিক প্রশাসন গড়ে তোলা হয়, যার প্রধান হিসেবে গভর্নর (ওয়ালি/আমির) নিযুক্ত হন। এ ছাড়া ছিল ‘দিওয়ান’ ব্যবস্থা (প্রশাসনিক নথি ও বেতন-ভাতার দপ্তর), পররাষ্ট্র ও পত্রবিনিময় বিভাগ, সামরিক বিভাগ এবং জননিরাপত্তা (শুরতা) বিভাগ। গভর্নরগণও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন; হযরত উমর রা. নিয়মিত তাঁদের সম্পদ ও কার্যকলাপের হিসাব গ্রহণ করতেন।

অষ্টম অধ্যায়: খলিফার দায়িত্ব ও নাগরিক অধিকার

খিলাফত একটি দায়িত্ব ও আমানত, কোনো ভোগের অধিকার নয়। খলিফার উপর উম্মাহর প্রতি কতিপয় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বর্তায়, পাশাপাশি নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়। এই অধ্যায়ে খলিফার দায়িত্ব ও নাগরিক অধিকার আলোচিত হবে।

খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইমাম মাওয়ার্দী রহ. খলিফার দশটি প্রধান দায়িত্ব উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে এগুলো হলো—দ্বীনকে তার বিশুদ্ধ রূপে সংরক্ষণ করা ও বিদ‘আত প্রতিরোধ করা; বিবাদমান পক্ষসমূহের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা; জানমাল ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; শরঈ শাস্তি (হুদুদ) যথাযথভাবে কার্যকর করা; সীমান্ত ও দেশরক্ষা সুদৃঢ় করা; দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা; বৈধ খাত থেকে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব সংগ্রহ করা; বায়তুল মাল থেকে হকদারদের অধিকার যথাসময়ে প্রদান করা; যোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব অর্পণ করা; এবং স্বয়ং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি তদারকি করা যাতে দায়িত্বে শৈথিল্য না আসে।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

ইসলামি খিলাফতে নাগরিকদের—মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে—কতিপয় মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়। জীবনের অধিকার সর্বাগ্রে; অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণহরণ গুরুতর অপরাধ। সম্পদের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার সংরক্ষিত। সম্ভ্রম ও মর্যাদার সুরক্ষা, ন্যায়বিচার লাভের অধিকার এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিটি নাগরিকের প্রাপ্য। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও শাসকের সমালোচনার অধিকার ইসলামি শাসনব্যবস্থার একটি স্বীকৃত নীতি।

অমুসলিম নাগরিকদের (যিম্মি) ধর্মীয় স্বাধীনতা, উপাসনালয়ের সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা ইসলামি রাষ্ট্রে নিশ্চিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিম্মিদের অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন—

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ حَقًّا ... فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) ব্যক্তির উপর জুলুম করবে কিংবা তার কোনো অধিকার খর্ব করবে ... কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে বাদী হব।’

(সুনানে আবু দাউদ)

এভাবে দায়িত্ব ও অধিকারের ভারসাম্যপূর্ণ এই কাঠামোই খিলাফতকে একটি ন্যায়ভিত্তিক কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করে, যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই শরিয়তের অধীন।

নবম অধ্যায়: খিলাফতের পতন ও বিলুপ্তি (১৯২৪)

প্রায় তেরো শতাব্দীর ধারাবাহিকতার পর ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটে। এটি ছিল মুসলিম ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ও বেদনাদায়ক অধ্যায়। এই অধ্যায়ে খিলাফতের পতনের কারণ ও পরিণতি আলোচিত হবে।

পতনের পশ্চাৎপট ও কারণসমূহ

খিলাফতের পতন কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; এর পেছনে ছিল দীর্ঘকালীন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানা কারণ। অভ্যন্তরীণ কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শাসনে নৈতিক অবক্ষয়, শূরা ও জবাবদিহিতার নীতি থেকে বিচ্যুতি, ইলম ও ইজতিহাদের স্থবিরতা, এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা। বাহ্যিক কারণসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন, শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী প্রযুক্তিগত ব্যবধান এবং পশ্চিমা মদদপুষ্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থান।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪–১৯১৮) উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরাজয় এই পতনকে ত্বরান্বিত করে। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ আরব ভূখণ্ড ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৪ সালে গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সিদ্ধান্তে খিলাফত প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মজিদকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়।

পতনের পরিণতি

খিলাফতের বিলুপ্তির ফলে মুসলিম উম্মাহ এক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন অবস্থায় উপনীত হয়। এর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি পরিণতিসমূহের মধ্যে রয়েছে—মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক বিভাজন ও জাতিরাষ্ট্রে বিভক্তি, ঔপনিবেশিক সীমারেখা অনুযায়ী কৃত্রিম রাষ্ট্রসৃষ্টি, ইসলামি আইন ও শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং উম্মাহর সম্মিলিত শক্তি

ও পরিচয়ের সংকট। খিলাফত-পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নে গোটা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আলোচনা ও বিভিন্ন আন্দোলনের সূচনা হয়, যা আজও বিভিন্ন রূপে অব্যাহত রয়েছে। ভারতবর্ষে এই প্রেক্ষাপটে 'খিলাফত আন্দোলন' (১৯১৯–১৯২৪) সংঘটিত হয়, যেখানে উপমহাদেশের মুসলিমগণ উসমানীয় খিলাফত রক্ষার দাবিতে সংগঠিত হয়েছিলেন। যদিও এই আন্দোলন খিলাফত রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তবু এটি মুসলিম রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

দশম অধ্যায়: আধুনিক যুগে খিলাফত — প্রাসঙ্গিকতা ও চ্যালেঞ্জ

খিলাফতের বিলুপ্তির এক শতাব্দী পেরিয়ে আজও ‘ইসলামি শাসনব্যবস্থা’ ও ‘খিলাফত’ মুসলিম চিন্তাজগতে একটি জীবন্ত আলোচ্য বিষয়। এই অধ্যায়ে আধুনিক যুগে খিলাফতের প্রাসঙ্গিকতা, এ সম্পর্কিত নানা দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা হবে।

খিলাফত-চিন্তার সমকালীন ধারা

আধুনিক মুসলিম চিন্তকদের মধ্যে খিলাফত-বিষয়ে মূলত কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদল মনে করেন, খিলাফত একটি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা উম্মাহর অপরিহার্য কর্তব্য। আরেক দল মনে করেন, খিলাফতের মূল হলো এর নীতি ও মূল্যবোধ—ন্যায়বিচার, শূরা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন; এই নীতিসমূহ সমকালীন বৈধ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমেও বাস্তবায়ন সম্ভব। তৃতীয় একটি ধারা খিলাফতকে মূলত একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে এবং সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেয়। এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ সমকালীন ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সমকালীন চ্যালেঞ্জসমূহ

খিলাফতের নীতি ও আদর্শ সমকালীন প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের পথে নানা চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। প্রথমত, মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক বিভাজন ও জাতিরাষ্ট্রকেন্দ্রিক বাস্তবতা ঐক্যের পথে বড় বাধা। দ্বিতীয়ত, খিলাফতের নামে কতিপয় গোষ্ঠীর সহিংস ও বিকৃত প্রয়োগ এই ধারণাটির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং প্রকৃত ইসলামি শিক্ষার বিপরীত বার্তা ছড়িয়েছে। তৃতীয়ত, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে শরঈ নীতির সমন্বয়ে গভীর ইজতিহাদ ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। চতুর্থত, আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য ও নেতৃত্বসংকটও একটি বাস্তব চ্যালেঞ্জ।

ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

এই গবেষণার আলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ উপসংহারে পৌঁছানো যায়—খিলাফতের প্রকৃত মর্ম নিহিত রয়েছে এর মৌলিক নীতিমালায়: আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, শরিয়তের কর্তৃত্ব, ন্যায়বিচার, শূরা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা ও জনকল্যাণ। এই নীতিসমূহ চিরন্তন ও সর্বজনীন। খিলাফতের পুনরুজ্জীবন কোনো আকস্মিক বা সহিংস প্রক্রিয়ায় নয়; বরং তা সম্ভব ইলম, তাকওয়া, নৈতিক পুনর্জাগরণ, উম্মাহর ঐক্য এবং ক্রমান্বয়ে এই নীতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ইসলামি শিক্ষার আলোকে চরমপন্থা ও সহিংসতা প্রকৃত খিলাফতের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী—কারণ খিলাফতের লক্ষ্যই হলো মানবকল্যাণ, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।

উপসংহার

এই গবেষণায় 'ইসলামি শাসনব্যবস্থা — খিলাফত' বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও নির্ভরযোগ্য ইসলামি উৎসের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমত, খিলাফত হলো নবুওয়াতের স্থলাভিষিক্ত একটি শাসনব্যবস্থা, যার মূল লক্ষ্য দ্বীনের সংরক্ষণ ও শরিয়তের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। এর সার্বভৌমত্বের উৎস আল্লাহ তাআলা, এবং এর সর্বোচ্চ আইন কুরআন ও সুন্নাহ। দ্বিতীয়ত, খিলাফত প্রতিষ্ঠা শরিয়ত ও বুদ্ধি—উভয় বিবেচনায় আবশ্যক (ফরযে কিফায়া), যা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। তৃতীয়ত, খিলাফতের প্রকৃত আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনে—যেখানে শূরা, ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা ও জনকল্যাণ ছিল মূল বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থত, খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান; খিলাফত জবাবদিহিমূলক ও শরিয়তনির্ভর, পক্ষান্তরে রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক ও স্বেচ্ছাচারপ্রবণ। পঞ্চমত, ১৯২৪ সালে খিলাফতের বিলুপ্তি উম্মাহর ইতিহাসে একটি গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে, যার প্রতিকারে প্রয়োজন ইলম, ঐক্য ও নৈতিক পুনর্জাগরণ। সর্বোপরি, খিলাফতের প্রকৃত মর্ম নিহিত এর চিরন্তন নীতিমালায়—আল্লাহর সার্বভৌমত্ব,

শরিয়তের কর্তৃত্ব, ন্যায়, শূরা ও জনকল্যাণ; আর এই নীতিসমূহের অনুসরণেই নিহিত উম্মাহর প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ।

পরিশেষে, এই বিষয়ের ব্যাপকতা বিবেচনায় ভবিষ্যতে খিলাফতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, আধুনিক সাংবিধানিক চিন্তার সাথে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং সমকালীন প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নিয়ে আরও গভীর গবেষণার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক বোঝার তাওফিক দান করুন এবং উম্মাহকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন—আমিন।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূল উৎস

1. আল-কুরআনুল কারীম।

2. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। আল-জামি'উস সহিহ (সহিহ বুখারী)।

3. ইমাম মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরি। আল-জামি'উস সহিহ (সহিহ মুসলিম)।

4. ইমাম আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশ'আস। আস-সুনান।

5. ইমাম তিরমিযি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা। আল-জামি' (সুনানে তিরমিযি)।

6. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল। আল-মুসনাদ।

খ. শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ

1. আল-মাওয়ার্দী, আবুল হাসান। আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ।

2. আল-জুওয়াইনি, ইমামুল হারামাইন। গিয়াসুল উমাম ফি ইলতিয়াসিয যুলাম।

3. আল-গাযালী, আবু হামিদ। আল-ইক্তিসাদ ফিল ই'তিকাদ।

4. ইবনে তাইমিয়া, তাকীউদ্দীন আহমাদ। আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইয়্যাহ।

5. ইবনে খালদুন, আবদুর রহমান। আল-মুকাদ্দিমা।

6. ইবনে মনযুর, মুহাম্মদ ইবনে মুকাররাম। লিসানুল আরব।

7. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা; ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা।

8. আল-কালকাশান্দি, আহমাদ। মাআসিরুল ইনাফা ফি মা'আলিমিল খিলাফা।

9. শাইখ মাহমুদ শাকির। চার খলীফা: ইসলামী শাসনামলের সোনালি যুগ (আল-খুলাফাউর রাশিদুন)।

গ. আধুনিক গ্রন্থ ও গবেষণা

1. মওদুদী, সাইয়িদ আবুল আ'লা। খিলাফত ও রাজতন্ত্র (খিলাফত ও মুলুকিয়াত)।

2. মওদুদী, সাইয়িদ আবুল আ'লা। ইসলামি রাষ্ট্র (ইসলামি রিয়াসাত)।

3. হামিদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ। দি ফার্স্ট রিটেন কনস্টিটিউশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড; ইসলাম কা সিয়াসি নিযাম।

4. আন-নাবহানি, তাকীউদ্দীন। নিযামুল হুকম ফিল ইসলাম।

5. আল-কারদাভি, ড. ইউসুফ। মিন ফিকহিদ দাওলাহ ফিল ইসলাম।

6. আসাদ, মুহাম্মদ। দি প্রিন্সিপলস অব স্টেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইন ইসলাম।

7. উমরি, ড. জিয়াউদ্দিন। ইসলামি রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা (অনূদিত)।